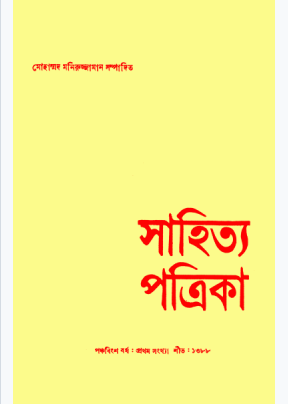

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রাচীন ভারতে রাজ-কোষবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রাধাগোবিন্দ বসাক
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.14
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.14
Pages	225-232
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

প্রাচীন ভারতে রাজ-কোষবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা

রাধাগোবিন্দ বসাক

কোষ—সপ্তাঙ্গ রাজ্যের এক অঙ্গ বা "প্রকৃতি"

প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজনীতিশাস্ত্রকারগণ রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ বা সপ্ত-প্রকৃতিক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। রাজ্যের সেই সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতির নাম—(১) স্বামী, (২) অমাত্য, (৩) জনপদ বা রাষ্ট্র, (৪) দুর্গ, (৫) কোষ, (৬) দণ্ড বা বল ও (৭) মিত্র বা সুহৃৎ। এই প্রত্যেকটি সুস্থ বা অবিকল না থাকিলে রাজ্যের কল্যাণ নাই। শুক্রাচার্য্য এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যকে মানুষী-তনুর প্রতিকৃতিরূপে কল্পনা করিয়া স্বামী বা রাজাকে এই রাজ্যদেহের মস্তকরূপে, অমাত্যবর্গকে নেত্ররূপে, মিত্র বা সুহৃৎকে কর্ণরূপে, কোষকে মুখরূপে, দণ্ড বা বলকে মনোরূপে, দুর্গকে হস্তরূপে ও রাষ্ট্র বা জনপদকে ইহার পাদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মুখদ্বারা আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিয়া মানুষ শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। রাজ্যের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যও কোষরূপ মুখের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। ইংরেজীতে আমরা রাজার যে শক্তিকে "Majesty" বলি প্রাচীন শাস্ত্র কারগণ তাহাকেই প্রতাপ বা প্রভাব নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"স প্রতাপঃ প্রভাবশ্চ যত্তেজঃ কোষদণ্ডজম্"—রাজার কোষ ও দণ্ড হইতে সমুত্থিত যে তেজঃ, তাহাই তাহার প্রতাপ বা প্রভাব। কোষ ও সৈন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুব্যবস্থিত রাখিতে পারিলেই রাজার "Majesty" বা প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। আজ আমরা এখানে কেবল কোষ-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়

বর্ত্তমান সময়ে ভারত-সরকারের সহিত প্রাদেশিক-সরকার সমূহের রাজস্ব লইয়া যেরূপ সম্পর্ক ও সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বা থাকা উচিত—আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচীন উত্তরাপথের বা দক্ষিণাপথের কোন বৃহৎ সাম্রাজ্যের সহিত তদধীন খণ্ড খণ্ড সামন্ত রাজমণ্ডলের সেরূপ কোন সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ছিল কি না তাহার কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। প্রাচীন ভারতে যে কোন রাজতন্ত্রপ্রদেশের ভিতর কিরূপভাবে রাজস্ব-বিভাগ পরিচালিত হইত, এখানে তাহাই যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে যে যে বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান—(১) নানাবিধ রাজস্ব, ভাগধেয়, কর, বলি ও শুল্কের উৎপত্তি-কাহিনী ও তাহার তত্ত্বকথা; (২) কোন কোন বিষয়ে করাদি আদেয় ছিল ও তাহার হার; (৩) করসংগ্রহকারী ও তদ্‌বিনিয়োগকারী রাজপুরুষগণের ক্রিয়া-কলাপ; (৪) আপদ্ সময়ে নূতন করাদি প্রবর্ত্তনের বিধি; (৫) সরকারী আয়ব্যয়ের তালিকা ও তাহার হিসাবরক্ষকগণের করণীয় ব্যবস্থা; ও (৬) রাজ্যের আয়ব্যয়ের দায়িত্ব-ভার। এই বিষয়গুলি ছাড়া আরও প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত অন্যান্য কথার যথা-সম্ভব উল্লেখ করা গিয়াছে।

কোনও এক প্রসঙ্গে [১।১৩ অধ্যায়] নীতিবিশারদ্ মহামতি কৌটিল্য রাজার প্রথম উৎপত্তি ও প্রজার সহিত তাঁহার কিরূপ সংবিৎবাপন (রফা) থাকিবে তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"মাৎস্যন্যায়াভিভূতাঃ প্রজা মনুং বৈবস্বতং রাজানং চক্রিরে। ধান্যবড্ভাগং পণ্য-দশভাগং হিরণ্যং চাস্য ভাগধেয়ং প্রকল্পরামাসুঃ। তেন ভৃতা রাজানঃ প্রজানাং যোগ ক্ষেমবহাঃ। তেষাং কিল্বিষং দণ্ডকরা হরন্তি যোগক্ষেমবহাশ্চ প্রজানাম্। তস্মাদুঞ্ছ-ষড্ভাগমারণ্যকা অপি নিরপন্তি—তস্যৈতদ্, ভাগধেয়ং যোহস্মান্ গোপায়তীতি"।

প্রথম কর-সৃষ্টির কল্পনা

এই উদ্ধৃত সন্দর্ভে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে রাজা ও প্রজার মধ্যে রক্ষণমূল্য ভাগধেয় বা কর লইয়া যেপ্রকার এক চুক্তিনামা চলিয়া আসিতেছে তাহার পরিষ্কার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকের এই পণ্ডিত যখন এত স্পষ্টভাবে এই চুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—তখন তদপেক্ষা প্রাচীনতর সময় হইতেই রাজনীতিশাস্ত্রের এই মত-বাদ যে চলিয়া আসিতেছিল এইরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান সময়েও আমরা রাজার বা সরকারী শাসন-প্রণালীর কোন দোষ বা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের কার্য্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়া থাকি—"প্রজারা নানাপ্রকার কর-শুল্কাদি দিয়া থাকে, সুতরাং রাজা প্রজা হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না কেন? রাজা ত প্রজার ভৃতিতে ভৃত—অতএব তিনি প্রজার সেবক বা ভৃত্য। এখন দেখা যাউক কৌটিল্যের বাক্যের অর্থ কি। তিনি লিখিতেছেন—প্রজাগণ মাৎস্য-ন্যায়ে বা অরাজকতায় ক্লেশ-ভোগ করিয়া বৈবস্বত মনুকে সর্ব্বপ্রথম রাজা নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন যে, তদীয় রক্ষা-কার্য্যের বেতন জন্য তিনি প্রজা কর্ত্তৃক উৎপন্ন ধান্যের ষষ্ঠ অংশ ও পণ্যের (বিক্রেয় দ্রব্যাদির) দশম অংশ ও অন্যান্য কারণে রাজপ্রাপ্য তৎ-তৎ-প্রদেশ-প্রসিদ্ধ হিরণ্য (নগদ মুদ্রা) ভাগধেয়রূপে প্রজার নিকট হইতে পাইবেন। এই ভাগধেয়-রূপ ভৃতি গ্রহণ করিয়া তিনি প্রজাগণের যোগ ও ক্ষেম সাধন করিতে পারিবেন। ["অলভ্যলাভো যোগঃ স্যাৎ ক্ষেমো লব্ধস্য পালনম্" ইতি যাদবঃ।] রাজার আদেয় দণ্ড (অর্থদণ্ড লব্ধ ধন) ও কর রাজ্যের কিল্বিষ (চৌর্য্যাদিজনিত নানারূপ পাপ) দূর করিতে ও প্রজার যোগ-ক্ষেম-সাধক হইতে পারে। এই নিমিত্ত আরণ্যক ঋষিগণও তাঁহাদের উঞ্ছবৃত্তি-লব্ধ ধান্যাদির ষষ্ঠভাগ রাজাকে প্রদান করিতেন এবং ভাবিতেন—"এই ভাগধেয় তাঁহারই লভ্য—যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন"। রাজা করদায়ীকে রক্ষা করেন তাই গৌতম ও ধর্ম্মসূত্রে রাজাকে "তদ্রক্ষণ-ধর্ম্মী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রজার রক্ষা বিধানের মূল্যরূপেই রাজা রাজস্ব বা কর পাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য হইল প্রজার রক্ষাকার্য্য এবং উহার মূল্য স্বরূপ হইল প্রজা-প্রদত্ত করে বা ভাগধেয়ে তাঁহার অধিকার। কিন্তু তাহাতে অধিকারী বলিয়া তিনি প্রজার দুঃখ-দৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উৎপীড়ন সহকারে যথেচ্ছভাবে মূলোচ্ছেদনপূর্ব্বক যদি নিজপ্রাপ্য আদায় করিয়া লয়েন, তাহা হইলে সে রাজাকে নিজ কর্ত্তব্যবিমুখ, সুতরাং অপ্রশংসার পাত্র, বলিয়া মনে করা হইত।

করতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতে রাজার প্রধান লক্ষ্য থাকিত—স্বরাজ্যের প্রজা-সমূহ "দণ্ড-করসহ" কি নয়, অর্থাৎ রাজবিধেয় দণ্ড ও করের মাত্রা তাহারা সহ্য করিতে পারিবেন কি না। এই

বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াই দণ্ড-করাদির প্রণয়নও সংগ্রহ করা হইত। মহাভারতের একস্থানে কোষাৎপাদনে রাজার উৎপীড়ন ক্ষমাই বলিয়া উল্লিখিত হইলেও—

নান্যান পীড়য়িত্বেহ কোশঃ শক্যঃ কুতোবলম্।
তদর্থং পীড়য়িত্বা চদোষং প্রাপ্তুং ন সোহর্হতি ।। ১৩০।৩৬

তাঁহাকে কখনই অত্যুৎপীড়ক হইতে হইবে না এইরূপ শত শত উপদেশও মহাভারতের অন্যত্র ও নীতিশাস্ত্রের ও স্মৃতি প্রভৃতিতে উল্লিখিত পাওয়া যায়। "তুমি মালাকার পুষ্পোদ্যানে যাইয়া পুষ্প তুলিয়া আনিলেই তোমার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, পুষ্পবৃক্ষটি উন্মূলিত করিবার অধিকার তোমার নাই। গোপালকে বৎসপানোপযোগী দুগ্ধ রাখিয়া দোহন করিতে হইবে। মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তোমাকে অল্পাল্প কর সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত রাখিয়া প্রজার হিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিতে হইবে। অন্যথা প্রজার বিরাগে তোমার রাজ্যনাশ ধ্রুব, তোমার সিংহাসনচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী"—এই প্রকারেই প্রাচীন শাস্ত্রকরগণ রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধে রাজাকে সর্ব্বদা অপ্রমাদী থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম প্রথম কল্পিত কর প্রজাকে সহ্য করাইতে পারিলে তিনি ক্রমশঃ করবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ব্যাঘ্রী নিজ অপত্যজাতকে তীক্ষ্ণ দন্তদ্বারা দংশন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু অপত্য স্নেহবশতঃ সেই তীক্ষ্ণদংশনেও এমন একটা মৃদুতা থাকে যে, অপত্য তজ্জন্য কোন বেদনা ভোগ করে না। জলৌকা মানুষের রক্ত পান করে বটে, কিন্তু মানুষকে তাহা বুঝিতে দেয় না। মূষিকও অনেক সময় নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থিত মাংস কাটিয়া লইয়া যায়, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তি তাহাতে জাগ্রতও হয় না। এইভাবেই নরপতি প্রজাবর্গকে নিজ প্রজা বা সন্ততিরূপে মনে করিয়া মৃদু উপায়ে করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া কর সংগ্রহণকারী রাজকর্ম্মকরদিগকে উপদেশ দিয়া দিতেন। তাই মহাভারতকার পুনরায় একস্থানে লিখিয়াছেন—

অল্পেনাল্পেন দেয়েন বর্দ্ধমানং প্রদাপয়েৎ।
ততো ভূয়স্ততো ভূয়ঃ ক্রমবৃদ্ধিং সমাচরেৎ।। ৮৮।৭

প্রথমতঃ অল্প অল্প করিয়া প্রদান করিলে পর যখন প্রজা সমৃদ্ধতর হইবে, তখন বর্দ্ধিত হারে তাহার নিকট হইতে রাজা আদায়ের উপায় করিয়া লইবেন। 'তারপর আরও একটু অধিক তারপর আরও একটু অধিক এইরূপে ক্রম-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন। আপদ্-কাল ব্যতীত অন্য কোনও সময়ে রাজা কখনও অশাস্ত্রীয় কর লইতে পারিতেন না। সর্ব্বপ্রকার করাদি ও তাহার হার নিয়মিত ছিল। তাহার ব্যতিক্রম রাজা করিতে পারিতেন না। কর-প্রণয়নে ও তৎসংগ্রহে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা খাটিত না। শাসন-প্রণালীর সৌকর্য্যার্থ প্রজাগণও ধর্ম্মবিহিত করাদি প্রদান করিতে বাধ্য হইত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারত-সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আয়ের পথ ভূমি-কর (Land-revenue) এবং তাহা নগদ টাকায় সংগৃহীত হয়। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে অধুনাতন ভূমিকরের মত কোনও কর প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভূ-স্বামিত্ব কাহার? রাজার না, প্রজার? এই সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নের বিচার এই প্রবন্ধে চলিতে পারে না, কারণ ইহার সমাধানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীন কালের যে, সমস্ত ভূমি-বিক্রয় সম্পর্কীয় বা ভূমি-দান বিষয়ক তাম্র-শাসনাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম নিপুণভাবে গ্রহণ করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, বোধ করি, তখনকার দিনে প্রজারাই ভূমির প্রথম স্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য হইত। পরে, ক্রমশঃ রাজাকে ভূমিপতি বলা হইতে থাকে। ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষি-প্রধান দেশ, তাই কৃষ্ট ভূমির প্রধান উৎপাদ্য যে ধান্যাদি

তাহার ভাগ দেওয়াই সর্ব্বপ্রথম প্রধান কর বা বলি ছিল এবং কৃষ্টভূমির অতিভোগ, মধ্যমভোগ ও অল্প ভোগ অনুসরণ করিয়া এই ভাগধেয় হার দশমভাগ, অষ্টমভাগ বা ষষ্ঠভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা কিন্তু অতি প্রাচীন সময়ের কথা—কিন্তু পরে সাধারণতঃ ধান্যাদির ষড়্ভাগই বলিরূপে ধার্য্য হইয়া গৃহীত হইত। প্রথম কোনও পতিত ভূমিখণ্ডে জনপদ নিবেশকালে রাজাকে দেখিতে হইত যে, প্রত্যেক নূতন গ্রামে ১০০ হইতে ৫০০ কুল বা গৃহস্থের বাস থাকে এবং গ্রামটি শূদ্র জাতীয় কর্ষকবহুল হয়। এই প্রকার ১০টি, ২০০টি, ৪০০টি ও ৮০০টি গ্রাম-সমষ্টির যথাক্রমে নাম ছিল "সংগ্রহণ", "কার্বটীক" (cf. Thana Town), "দ্রোণমুখ" (cf. S.D. Town) ও "স্থানীয়" (cf. D.T. Town) এইসমস্ত স্থানে রাজা ঋত্বিক্, আচার্য্য, রাজা পুরোহিত ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে "ব্রহ্মদেয়" সংজ্ঞক ক্ষেত্রভূমি দণ্ড-কর রহিত করিয়া দান করিতেন। রাজকীয় বিভিন্ন শাসন-বিভাগের অধ্যক্ষগণ, সংখ্যায়ক প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণ, "গোপ" নামক দশগ্রামাধিপতি ও "স্থানিক" নামক নগর চতুর্ভাগাধিকারী ও অন্যান্য বড় বড় কয়েকজন রাজভৃত্যও বিক্রয়ও আধানের অধিকার বর্জ্জনে বিনাকরে এইরূপ ক্ষেত্রাদি ভোগজন্য পাইয়া থাকিতেন। কৃষকগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রবিহিত রাজদেয় ভাগাদি কররূপে দিতে স্বীকৃত থাকিত তাহারাই "কৃত-ক্ষেত্র" (কর্ষণ-বপন-যোগ্য) পাইত এবং যাহারা "অকৃত" (সাধ্য সৌষ্ঠব) ক্ষেত্র কর্ষণযোগ্য করার চেষ্টা করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইত না বরং সে-ক্ষেত্রকে হল-প্রয়োগের উপযোগী না করিতে পারিলে তাহারা ক্ষতিপূরণ জন্য রাজাকে কিছু দিত। এমনকি, সেই অবস্থায় অনেক সময় রাজা তাহাদিগকে ধান্য, পশু ও হিরণ্য (নগদ টাকা) দিয়াও অনুগ্রহ করিতেন। কিন্তু এইরূপ পরিহার (exemption) ও অনুগ্রহ করিতে যাইয়া রাজাকে লক্ষ্য রাখিতে হইত যেন তদ্দ্বারা রাজ্যের কোষক্ষয় না ঘটে।

শুল্কবিধি ও তাহার হার

ঠিক বর্ত্তমান কালের প্রথাতে প্রজার স্বোপার্জিত আয়ের উপর যে ভাবে যত হারে কর নির্দ্দিষ্ট হইতেছে প্রাচীন সময়ে তদ্রূপ আয়কর বিহিত না থাকিলেও প্রায় প্রত্যেক প্রজাকেই কোনও না কোন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর দিতে হইতই। কি পশুরক্ষক, কি হিরণ্যের বৃদ্ধি-প্রযোক্তা (সুদখোর), কি পণ্যব্যবহারী বণিক্, কি ফলমূলাদি বিক্রেতা সকলকেই নিয়মিত হারে নানা প্রকার শুল্কাদি দিতে হইত। নিষ্ক্রাম্য (exported) ও প্রবেশ্য (inported) উভয়বিধ পণ্যজাতের উপরই শুল্কের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতে কোন পণ্যই ইহার জাতি-ভূমিতে অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানে বিক্রীত হইতে পারিত না। এই বিধি একটু কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা মধ্যবর্ত্তী ক্রেতৃগণের হস্ত পরিবর্ত্তন হইতে পণ্যের রক্ষা সাধন করিয়া তাহার মূল্য সহনোপযোগী করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। পরদেশজাত পণ্য রাজার নিজ জনপদে বা নিজের জনপদ-জাতপণ্য স্বরাজ্যস্থিত দুর্গে, নগরে ও নিগমে প্রবেশ্য হইলে তৎ-তৎ-পণ্যের যাহা মূল্য তাহার পঞ্চভাগ রাজাদেয় শুল্ক—ইহাই সামান্যবিধি। কিন্তু পুষ্প, ফল, শাক, শুষ্ক মৎস্য ও মাংসাদির শুল্ক ষষ্ঠভাগ, ক্ষৌম; দুকূলাদী সূক্ষ্ম বস্ত্র, লৌহময় ও ধাতুজ দ্রব্যাদি, চন্দনাদি, সুরা, গজদন্তনির্ম্মিত ও চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদির শুল্ক দশভাগ বা পঞ্চভাগ; এবং অন্যান্য বস্ত্র, চতুষ্পদ ও দ্বিপাদাদি জন্তু, সূত্র, কার্পাস, গন্ধদ্রব্য, ভৈষজ্য, কাষ্ঠ, মৃদ্ভাণ্ডাদি, তৈলাদি স্নেহময় পদার্থ, ক্ষার, লবণ ও পক্কান্নাদির শুল্ক বিংশতি ভাগ অথবা পঞ্চ বিংশতি ভাগ বিধেয় ছিল। শঙ্খ, হীরক, মণিমুক্তা প্রবালাদির উপর কোন শুল্কের ভাগ রাজবিধি নির্দ্দিষ্ট থাকিত না,—জহুরী বা তল্পপক্ষণবিদগণ এইপ্রকার পণ্যের উপর যে শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিতেন—তাহাই রাজার প্রাপ্য ছিল। নানারূপ অপরাধ প্রমাণিত হইলে রাজবিহিত যে অর্থদণ্ড অপরাধীকে দিতে হইত তদ্দ্বারাও রাজকোষের বেশ আয় হইত। শুল্ক প্রসঙ্গে

এইরূপ আয়ের একটু পরিচয় দিতেছি। লৌহ লবণাদি খনিজ বস্তুর তৎ-তৎ-খনিতে ক্রীত হইলে ক্রেতাকে ৬০০ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত, পুষ্পবাট ও ফলবাট হইতে পুষ্প বা ফল গৃহীত হইলে ৫৪ পণ, শাকাদির ক্ষেত্র হইতে শাকাদি লইলে ৫২ পণ এবং অন্যান্য শস্য ও তৎ-তৎ-ক্ষেত্রে বিক্রীত হইলে গ্রহীতাকে ৫৩ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। যে-দ্রব্যের যে-শুল্ক বিহিত ছিল, তাহার পঞ্চভাগ লওয়ারও একটা বিধান ছিল। তাহার সংগ্রহের ভার দ্বারাধ্যক্ষের উপর অর্পিত ছিল। এবং সেইজন্যই এই করের নাম ছিল "দ্বারাদেয়"। তবে উপরি উল্লিখিত শুল্ক-সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রকার অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাজাতে ন্যস্ত থাকিত।

সেকালে অনেকগুলি শিল্প-বাণিজ্য রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। নৌনির্ম্মাণ, খনি, দারু প্রভৃতির বন, হস্তিবন ও অন্যান্য আরও কতকগুলি বিভাগের কেবল যে রক্ষণা-বেক্ষণের ভার রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল তাহা নহে, সেইসমস্ত বিভাগে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দ্বারা প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যাদির কারবারও রাজকীয় ছিল, এমন কি ইহার মধ্যে কত কারবার রাজার একমুখ অর্থাৎ একচেটে ছিল। রাজার হস্তে ন্যস্ত এই সকল একমুখ কারবার দ্বারা প্রজার বহুমুখ উপকার সাধিত হইত। রাজকীয় কারখানা বা কর্ম্মান্তে অনেক লোক কর্ম্মকর নিযুক্ত হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। বর্ত্তমানকালীন মধ্য-বিত্ত প্রজার অনিয়োগ সমস্যা (unemployment question) বোধ হয় এই কারণেই তদানীন্তন রাজাদের আলোচন ও পূরণ করিতে হইত না। সে যাহা হউক, খনিজ-দ্রব্যসমূহের মধ্যে লবণ একটি প্রধান দ্রব্য ও মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুজাতের মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক প্রজাকে যেমন এখন রাজপ্রণীত লবণ-শুল্কের কিছু পরিমাণে ভাগ অপ্রত্যক্ষভাবে বহন করিতে হয় প্রাচীনকালেও প্রায় তদ্রূপই ছিল। লবণ কিম্বা অন্য বস্তুর আকর কর্ম্মান্তের কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য ও বহুলোকের প্রযত্নসাধ্য বিবেচিত হইলে রাজারা তাহা ভাগে বা প্রক্রয়-প্রথায় পত্তন বা ইজারা দিতেন এবং লঘু ব্যয়সাধ্য ও লঘু প্রযত্নসাধ্য আকরগুলি নিজ অধ্যক্ষগণের পর্য্যবেক্ষণেই রাখিয়া দিতেন। আকর-জাত লবণ কর্ম্মান্ত হইতে ব্যবহারোপযোগী হইয়া নিষ্পন্ন হইলে লবণাধ্যক্ষকে নিয়মিত ভাগ সংগ্রহ করিতে হইত ও নিজ বিভাগে প্রস্তুত লবণের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইত। পূর্ব্ব-বর্ণিত নির্দ্দিষ্ট ভাগ ও প্রক্রয়লব্ধ লবণ সম্বন্ধে ব্যাজী নামক শুল্ক তাহাকেই সংগ্রহ করিতে হইত। এই ত গেল রাজার নিজ রাজ্যোৎপন্ন লবণ সম্বন্ধে বিধি। আগন্ত অর্থাৎ পরদেশজাত লবণের কারবার যাহারা করিত তাহারা প্রথম ক্রয়-সময়ে ব্যাজী ও রূপিক নামে প্রসিদ্ধ শুল্ক দিয়াই খরিদ করিত এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা পরদেশ-জাত লবণ ব্যবহার জন্য খরিদ করিত তাহারাও শুল্ক দিয়া ও রাজপণ্যের ছেদ-জনিত ক্ষতির পূরণার্থ বৈধরণ নামক এক প্রকার শুল্ক দিতে বাধ্য ছিল। বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কেহ রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে লবণের কারবার করিলে তাহাকে উত্তমদণ্ড অর্থাৎ ১০০০ পণ মুদ্রা অর্থ দণ্ডরূপে দিতে হইত। স্বদেশজাত আকরজ ও খনিজ দ্রব্যাদি ও তন্নির্ম্মিত পণ্য দ্রব্যাদির রক্ষা (protection) সম্বন্ধে পূর্ব্বতন রাজগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন বলিয়াই প্রজারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে তত কিছু ক্লেশ ভোগ করিত না। তাহার প্রমাণ এই লবণের কারবার।

রূপ-বিভাগ (Mint) ও লক্ষণাধ্যক্ষ

পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয় ব্যবহারেও রাজদেয় করদণ্ডাদির পরিশোধে ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা বা টাকার ব্যবহার ভারতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সুবর্ণ, রজত ও তাম্রময় মুদ্রার ব্যবহারই প্রাচীন কালে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। দীনার, পণ, অর্দ্ধপণ, পাদপণ, অষ্টভাগ

পণ, মাষ, অর্দ্ধ মাষ, কাকণী, অর্দ্ধ কাকণী প্রভৃতি মুদ্রার বহুবিধ নাম ছিল—স্বরূপতঃ ও ভারতের নানা প্রদেশে তৎ-তৎ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। দীনার সুবর্ণ-নির্ম্মিত, পণ্যাদি চতুষ্টয় রূপ্যনির্ম্মিত এবং মাষাদি তাম্র নির্ম্মিত ছিল। বিশুদ্ধ সুবর্ণাদি দ্বারা কখনই মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত না। রাজদণ্ডাদি পণ—নামক মুদ্রা দ্বারাই অধিকতর ভাগে সংখ্যাত হইত। এই পণ নামক "রূপ্য-রূপে" (অর্থাৎ রূপার মুদ্রাতে) চারি ভাগ তাম্র ও কালায়স রঙ্গ (রাঙ) সীস বা রসাঞ্জনের এক ভাগ এবং একাদশ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকিত। উল্লিখিত অন্যান্য মুদ্রাতেও এই অনুপাতেই খাদ মিশ্রিত থাকিত। বিশুদ্ধ ধাতু দ্বারা মুদ্রা সকল নির্ম্মিত হইত না বলিয়া লক্ষণাধ্যক্ষ বা টঙ্কাশালাধ্যক্ষের বিভাগ হইতেও রাজার বেশ আয় হইত। এখনও মুদ্রার মূল্য নির্ণয় লইয়া ভারতবর্ষে কত গোল-যোগ চলিতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাজার আদেশে নির্ম্মিত লাঞ্ছনযুক্ত এই মুদ্রা কারবারে বা রাজকোষের জমার জন্য, কোনও সাধারণ লোকের বা রাজপুরুষের গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না [অর্থাৎ ইহা legal tender রূপে ব্যবহৃত হইত]। ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরীক্ষা জন্য একজন রাজ-কর্ম্মচারী থাকিত, তাহার নাম 'রূপ-দর্শক'। একশত পণে আটপণ (রূপিক সংজ্ঞক) পাঁচ পণ (ব্যাজী সংজ্ঞক) বা সাড়ে বার পণ পারীক্ষিক সংজ্ঞক বাটার ব্যবস্থা দেওয়ার ভার এই রূপ-দর্শকের উপর ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সুবর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর মূল্য বৃদ্ধি হইলে শাসন-সরকার যে-রীতি অবলম্বন করিয়া পত্রমুদ্রা বা কাগজমুদ্রার প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং যে মুদ্রাতে অধুনাতন লক্ষণাধ্যক্ষ সরকার পক্ষে মুদ্রাতে উল্লিখিত টাকার সংখ্যা তদ্বাহককে চাওয়া মাত্র ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাদ্বারা পরিশোধের অঙ্গীকার করিয়া থাকেন—তদ্রূপ কাগজ-মুদ্রার প্রথা প্রাচীনভারতে কখনও ছিল বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু এখন আমরা কখনই এরূপ বুঝি না যে যত টাকা মূল্যের পত্রমুদ্রা সরকারী আফিস হইতে বাজারে প্রচলন জন্য নিষ্ক্রান্ত হয় তদনুরূপ ধাতুমুদ্রা রাজকোষে নাই।

বিবিধ আয়-মুখ

নিম্নে উল্লিখিত দুর্গাদিসংজ্ঞায় পরিচিত সাতটি বিষয় রাজস্বোৎপত্তির স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই সপ্তায়তন আয় শরীরের মধ্যে সপ্তষষ্টি প্রকারের আয়ের পথ উল্লিখিত আছে। যথা—

(ক) ১। ঘট্টদেয়াদি নানারূপ শুল্ক। ২। নানাপ্রকার রাজদণ্ড-লব্ধ আয়। ৩। তুলা ও মান সংক্রান্ত আয়। ৪। নাগরিক বিভাগের আয়। ৫। লক্ষণাধ্যক্ষের অর্থাৎ টঙ্কশালার আয়। ৬। মুদ্রাধ্যক্ষ বিভাগের [pass-port বিক্রয় জন্য] আয়। ৭। সুরাবিভাগের আয় (Excise)। ৮। সূনা বিভাগের (slaughter house) আয়। ৯। সূত্রাধ্যক্ষের আয়। ১০-১২। এবং তৈল, ঘৃত ও ক্ষার বস্তুর কারবার-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার ব্যতিক্রমজনিত আয়। ১৩-১৪। রাজ-সৌবর্ণিক ও রাজপণ্যশালার আয়। ১৫। বেশ্যাদের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থদ্বারা আয়। ১৬। ও দ্যূত বা জুয়াখেলার নিয়মজনিত আয়। ১৭। বাস্তুবিদ্যোপজীবিগণ (architects) হইতে লব্ধ আয়। ১৮-১৯। ও কারু শিল্পীগণের দেয় শুল্কাদি হইতে আয়। ২০। নগর দেবতাধ্যক্ষের আয়। ২১। দ্বারা দেয়। ও ২২। বাহিরিক অর্থাৎ নট-নর্ত্তকাদি হইতে গ্রাহ্য শুল্ক দ্বারা আয়। এই দ্বাবিংশতি উপায় দ্বারা লভ্য রাজস্ব দুর্গসংজ্ঞক।

(খ) ১। সীতা বা কৃষিসম্ভূত আয়। ২। প্রসিদ্ধ ধান্যাদির ষড়্ভাগ। ৩। বলি-নামক ধর্ম্ম দেবতা বিষয়ক কর। ৪। ফলবৃক্ষাদি সম্বন্ধীয় রাজদেয় কর। ৫। বণিকদের

দেয়। ৬। নদীপাল বা ঘাটরক্ষকদের দ্বারা প্রাপ্য আয়।৭। তর-নামক (জল-কর) ৮। নৌবিভাগের আয়। ৯। ছোট ছোট পট্টন নামক নগর সঞ্জাত আয়। ১০। এবং বিবীত বা ব্রজভূমি সঞ্জাত আয়। ১১। বর্ত্তনা (পথকর)। ১২। রজ্জু নামক কর (বিষয়পতি-দেয় ভূমির জরিপ জন্য কর)। এবং ১৩। চোর রজ্জু নামক কর (সম্ভবতঃ গ্রামদেয় চৌকিদারী টেক্স)। এই ত্রয়োদশ উপায়ে লব্ধ রাজস্ব রাষ্ট্র-সংজ্ঞক।

(গ) সুবর্ণ, রজত, হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ, লোহ, লবণ, ভূমিধাতু (সম্ভবতঃ কয়লা প্রভৃতি), প্রস্তর ধাতু ও রসধাতু এই দ্বাদশ খনিজ পদার্থের রাজকীয় কারবার-জনিতঃ রাজস্বোৎপত্তি। এই আয় খনি সংজ্ঞক।

(ঘ) কুঙ্কুমাদি কুসুমবাট, ফলবাট, পূগাদি ষণ্ড, কেদার (ধান্যাদি ক্ষেত্র) ও মূলবাপ (হরিদ্রা, আদ্রক প্রভৃতি ক্ষেত্র) এই ছয়টি স্থানে উৎপন্ন বস্তু হইতে প্রাপ্ত আয়। আমেরিকায় এইরূপ বহুলভাবে সরকার পরিচালিত ফলমুলাদির ও উৎপত্তি ও ব্যবসায়ের ব্যবস্থা অদ্যাপি আছে। এই আয় সেতু-সংজ্ঞায় পরিচিত।

(ঙ) পশুবন, মৃগবন, দ্রব্যবন (প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠাদির বন) ও হস্তিবন, এই চারি স্থান হইতে লভ্য আয় বন-সংজ্ঞায় পরিজ্ঞাত।

(চ) গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর (বেসর) এই আটটি পশুর রক্ষণ পোষণ বর্দ্ধন দ্বারা যে রাজকীয় কারবার (Farm) তাহা হইতে লব্ধ আয়। ইহা ব্রজ-সংজ্ঞায় অভিহিত।

(ছ) স্থলপথ ও জলপথ এই দুইটি উপায়ে যে রাজস্ব লাভ হইত তাহা বণিক্ পথ-সংজ্ঞায় জ্ঞাত ছিল। নগর হইতে নগরান্তরে পণ্যবাহী বণিকদের যাতায়াতের জন্য যে রাজমার্গ বিস্তৃত ছিল তদ্ব্যবহার জন্য তাহাদের নিকট হইতে এবং সমুদ্র-ব্যবহারী বণিকদিগের নিকট হইতে রাজার যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত তাহাই এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপরি উল্লিখিত উপায়ে উৎপন্ন রাজস্ব দ্বারা রাজার মূলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম মূল আয়। ধান্যাদি ভাগ দ্বারা লভ্য আয়ের নাম ভান। দ্রব্যাদি মাপিয়া লইবার সময় নিয়মিত হারে কিছু বেশী লইবার দরুণ যে আয় তাহার নাম ব্যাজী। নদী প্রভৃতির ঘাটে দেয় বা ঐ শ্রেণীর যে যে আয় তাহা পরিষ নামে পরিচিত। সমগ্র গ্রামাদি হইতে প্রাপ্য যে হিরণ্য বা ধান্যাদি প্রতিনিয়ত ছিল তাহার নাম ক্লপ্ত। লবণাদি দ্রব্য হইতে শত প্রস্থে যে অষ্টভাগাদি গৃহীত হইত তাহার নাম রূপিক এবং রাজদ্বারে প্রমাণিত অপরাধ-জনিত দণ্ডাদি হইতে যে আয় তাহার নাম প্রত্যয় আয়। এইরূপ আরও বহু প্রকার কর ও শুল্কের পারিভাষিক নাম প্রাচীন অর্থ-শাস্ত্রে ও নীতি-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যথা, পিণ্ডকর, সেনা-ভক্ত, উৎসঙ্গ, পার্শ্ব, পরিহীনক, তর, চৌরগ্রহণিক, হট্ট, উদকভাগ, নৌকা-হাটক প্রভৃতি। শিল্পিগণকে শুল্কের পরিবর্ত্তে মাসে একদিন করিয়া রাজাকে খাটিয়া দিতে হইত। সেই দিন কার্য্যই তাহাদের শুল্ক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই কার্য্যের দিনে তাহারা রাজবাড়ী হইতে ভক্ত বা অন্ন আহারার্থ পাইত। ইহার অপর নাম "বিষ্টি"। এখন রাজকোষ হইতে যে যে ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহার একটি তালিকা দিতেছি।

নানাবিধ ব্যয়মুখ

১। দেবপূজা (যজ্ঞাদি) পিতৃপূজা ও পর্ব্বাদি সময়ে ব্রাহ্মণ, বাল, বৃদ্ধ, আতুর ও অনাথদিগকে দান করার জন্য ব্যয়।

২। রাজ্যের মঙ্গল জন্য স্বস্তিবাচন ব্যয় অর্থাৎ শান্তিক ও পৌষ্টিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যয়।

৩। অন্তঃপুরস্থিত মহাদেবী (পাটরাণী) ও অন্যান্য দেবীগণ এবং রাজকুমারদিগের ভরণপোষণ ও ভোগবিলাস নিমিত্ত ব্যয়।

৪। রাজপাকশালার ব্যয়।

৫। দূতবিভাগীয় ব্যয়।

৬-১০। কোষ্ঠাগার, আয়ুধাগার, পণ্যাগার, কুপ্যগৃহ ও নানাদ্রব্যের কর্ম্মান্ত বা কারখানার কার্য্যজন্য ব্যয়।

১১। বিষ্টি অর্থাৎ আকস্মিক ক্রিয়া আপতিত হইলে কর্ম্মকর দ্বারা সেই কার্য্য নিষ্পাদন জন্য ব্যয়।

১২-১৫। হস্তি, অশ্ব, রথ, ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সেনার রক্ষণাদি ব্যয়।

১৬। গো-মহিষাদি পশু রক্ষণ জন্য ব্যয়।

১৭-২০। পশু, মৃগ, পক্ষী, ও সিংহব্যাঘ্রাদি ব্যাল জন্তুর বাট রক্ষণাদি ব্যয়।

২১-২২। কাষ্ঠ তৃণবাটের রক্ষণাদি ব্যয়।

এই দ্বাবিংশতি প্রকার ব্যয় উপদ্রব-শূন্য সময়ে শাসন-প্রণালী অক্ষুণ্ণভাবে চালাইবার জন্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ব্যয়গুলি বহন করিতে রাজসরকার কি পরিমাণ অর্থ রাজকোষ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়। রাজভৃত্যগণের বেতন নির্দ্দেশ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া কৌটিল্য একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধর্ম্ম (দানাদিক্রিয়া) ও অর্থের (লোকহিতকর ব্যয়বহুল কার্য্যের) প্রতিবন্ধ উৎপাদন না করিয়া, ও সর্ব্বপ্রকার আয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পুরদুর্গ ও জনপদের শক্তি-সামর্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া রাজাকে রাজ্যের সমগ্র আয়ের একপদ অর্থাৎ চতুর্থাংশ দ্বারা ["সমুদয় পাদেন"] যাবতীয় বিভাগের রাজপাদোপজীবিগণের বেতনাদি খরচ নিষ্পন্ন করিতে প্রয়াসবান হইতে হইবে। সর্ব্বদা আয়ব্যয় সম্যক্‌রূপে অবেক্ষণ করিয়া রাজসরকারকে রাজ্য চালাইতে হয়। এই কথা সত্য বটে যে, দণ্ড বা সৈন্যের বলে বলীয়ান থাকিলে শাসনপ্রণালী ঠিক চলিবার সম্ভাবনা, কিন্তু সৈন্যবিভাগ ঠিক রাখিতে হইলে কোষের প্রয়োজন অধিক। কোষ ও বল সপ্তাঙ্গরাজ্যের এই দুই প্রকৃতির সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন।

সামরিক বিভাগের ব্যয়

"বল-মূল্যে ভবেৎ কোশঃ কোশমূলং বলং স্মৃতম্" শুক্রনীতির এই বাক্যটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হওয়া অসঙ্গত নহে যে, রাজাকে বা রাজসরকারকে সৈন্য বিভাগের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রতিবৎসর খরচ করিতে হয় ও তাহা করাও উচিত। কিন্তু এইমাত্র বলিয়াছি যে, কৌটিল্যের মতে সৈন্যবিভাগ প্রভৃতি সমস্ত সরকারী বিভাগের মোট খরচ রাজ্যের সমগ্র আয়ের এক চতুর্থাংশ দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া বিধেয়। কেবল সৈন্য-বিভাগের খরচ কুলাইবার জন্য মোট রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক অংশ ব্যয় করিবার প্রয়োজন, বোধ হয়, ভারতের অতীত নৃপতিগণ বা তাঁহাদের মন্ত্রীপরিষৎ বা রাজস্ব-সচিবগণ কখনই অনুভব করিতেন না।*

* [প্রবাসী, আষাঢ় ১৬৩৪ (২৭ ভাগ, ১ম খণ্ড) থেকে পুনর্মুদ্রিত।]